৭ মার্চ উপলক্ষ্যে বিশেষ ফিচার

কেন তিনি রাজনীতির কবি

পরীক্ষিৎ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৭ সালের ভাদ্রে এবং আষাঢ়ে পরপর দুটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর প্রবন্ধ দুটির নাম যথাক্রমে 'বাঙালি কবি নয়' এবং 'বাঙালি কেন কবি নয়'। অর্থাৎ বাঙালি কবি নয় সে দাবী তিনি করেছেন এবং সেই দাবীর পক্ষে প্রমাণ হাজির করার চেষ্টা করেছেন অন্য প্রবন্ধে। তবে বাঙালির মধ্যে রবীন্দ্রনাথসহ অনেকেই অসংখ্য কালোত্তীর্ণ কবিতা লিখে গেছেন যা বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে বিশেষ মর্যাদার আসনে ঠাঁই পেয়েছে। জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, 'সকলেই কবি নন। কেউ কেউ কবি; কবি– কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং অনেক শতাব্দীর পাশাপাশি আধুনিক জগতের নব নব কাব্য বিকিরণ তাদের সাহায্য করছে।'

সাহিত্যের কবিতা ও কবি প্রসঙ্গে আলোচনা এই নিবন্ধের মুখ্য বিষয় নয়। এখানে আলোচনা করবো রাজনীতির কবি ও কবিতা নিয়ে। কে সেই রাজনীতির কবি? কোনটিই বা রাজনীতির কবিতা?

কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তাঁর 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় লিখেছেন 'আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি। / সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা/ সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সঙ্গীত কবিতা/ জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা/ রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা।/ আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারবো/ আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো।"

এ যেন ১৯৭১–এর ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণকে যে বাঙালি হৃদয়ে ধারণ করেন, তিনি ভাবতেই পারেন কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বোধ হয় সেই ঐতিহাসিক ভাষণকে মনে রেখে কবিতাটি লিখেছেন। বাঙালিরা না হয় সমস্ত আবেগ নিয়ে এভাবে ভাবতে পারেন। কিন্তু যখন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজউইক ম্যাগাজিন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও ৭ মার্চের ভাষণের ওপর প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করতে গিয়ে রাজনীতির কবি ও কবিতা প্রসঙ্গ টানেন তখন আবেগের উর্ধে এক নির্মোহ উপলব্ধির বিশ্বায়ন দেখি আমরা।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজউইক ম্যাগাজিনের সম্পাদক ও প্রতিবেদক জীবনানন্দ দাশের কথাগুলো জানতেন কিনা জানা যায়নি। তবে আমরা দেখেছি ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল নিউজউইক ম্যাগাজিন তাদের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। এই প্রতিবেদনে তাঁকে অভিহিত করা হয় 'রাজনীতির কবি' হিসেবে।

সেই প্রতিবেদনের এক পর্যায়ে বলা হয়েছে, 'তিনি (শেখ মুজিবুর রহমান) রাজনীতির একজন কবি, প্রকৌশলী নন, আর বাঙালিদের মধ্যে কারিগরি দিকের চেয়ে শিল্পকলার প্রতি অধিকতর ঝোঁক রয়েছে। সে কারণে মুজিবের নিজস্ব স্টাইল ঠিক তাই, যা ওই এলাকার সব শ্রেণি ও আদর্শের লোককে সংগঠিত করার জন্য দরকার।'

কখন এই অভিধায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিহিত করা হয়েছিল? ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের উত্তাল জনসমুদ্রের সভামঞ্চে যখন তিনি কবির হৃদয়ের কল্পনার ভিতরের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত ১১০৭টি শব্দ বললেন। যা ছিল অনবদ্য রাজনৈতিক ক্যারিশমাটিক বিভায় সজ্জিত। সুনিপূণ শব্দচয়ন ও স্বতঃস্ফূর্ত বাক্য বিন্যাসে গাঁথা একটি মহাকাব্য।

২.

জাতির পিতার ৭ মার্চের ভাষণে যে বহুমাত্রিকতা ছিল তা সর্বজনবিদিত। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. আবদুল খালেক-এর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর লেখা 'বঙ্গবন্ধুর উদারতা এবং উত্তরাধিকার' গ্রন্থের এক পর্যায়ে লিখেছেন, 'দার্শনিক যারা, তাঁরা এই ভাষণে বঙ্গবন্ধুকে আবিষ্কার করেছেন একজন প্রখ্যাত দার্শনিক হিসেবে, সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁকে বলতে চেয়েছেন একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে, কবি সাহিত্যিকরা বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটিকে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে উল্লেখ করেছেন ভাষণটি বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা।' সকলেই যেমন কবি হতে পারেন না, তেমনি পৃথিবীর সব রাজনীতিবিদও কবির মর্যাদা পান না।'গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল, বাই

দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল উইল নেভার পেরিশ ফ্রম দ্য আর্থ' এর মতো উক্তিসমৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ১৮৬৩ সালের বিখ্যাত গেটিসবার্গ বক্তৃতা, ১৯৬৩ সালের মার্টিন লুথার কিংয়ের 'আই হ্যাভ অ্যা ড্রিম' ভাষণ অথবা ১৯৪০ সালের উইনস্টন চার্চিলের 'উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস' ভাষণ কিংবা ১৯৪৭ সালের জওহরলাল নেহেরুর 'অ্যা ট্রাইস্ট উইথ ডেস্টিনি'কে তো কাব্যের সাথে তুলনা কেউ করেননি। অথচ এগুলো বিশ্বের সেরা ভাষণের তালিকায় উপরের দিকেই আছে। অন্তত তিনট কারণে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি অনন্য স্বকীয়তা রাখে। এক. ভাষণটি অলিখিত; দুই. তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবে একটি শক্তিশালী উপস্থাপনা; তিন. ভাষণের মাঝে মাঝে আঞ্চলিক ও লোকায়ত ভাষার প্রয়োগ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল একটি অগ্নিমশাল যা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধের দাবানল । যে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম হয়েছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের, যার নাম বাংলাদেশ। এই ঐতিহাসিক ভাষণ শুধু বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়কেই নাড়া দেয়নি, সারাবিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল। এ ভাষণের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতিকে মুক্তির মোহনায় দাঁড় করিয়েছিলেন জাতির পিতা। সেদিন কেবল বাংলাদেশ নয়, পুরো বিশ্ব বুঝে গিয়েছিল এই ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি মুক্তিকামী সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য সামগ্রিক দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

সেদিন বঙ্গবন্ধু ভাষাশিল্পের সুনিপূণ কারগিরের মতোই শুরু করলেন এভাবে, 'ভাইয়েরা আমার। আজ-দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম?'

অসাধারণ কাব্যিক দ্যোতনা নিয়ে এক মহাকাব্যের সূচনা যেন। এরপর বঙ্গবন্ধু টানা প্রায় ১৯ মিনিট বলে গেলেন অমর মহাকাব্য। ভয়ানক চাপ আর টানটান উত্তেজনার মধ্যেও অলিখিত ভাষনের কোথাও থমকে যাননি বঙ্গবন্ধু।

পুরো ভাষণজুড়ে ছিল আসন্ন যুদ্ধের রণকৌশল ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। তবে তা ছিল বেশ কৌশলে, কবিতার মতো আড়ে আড়ে। 'তিনি এ দেশের মানুষের অধিকারের কথা বলেছেন। তিনি জানতেন, কোন পরিস্থিতিতে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাই এই ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু জাতির সামনে কেবল একটি স্বাধীন রাষ্ট্রই উপস্থাপন করেননি, এর ভবিষ্যৎ কী হবে তা-ও তুলে ধরেন।

৯০টি বাক্যে সংলাপের পর সংলাপে ছিল দ্বন্দ্ব ও রসের নানান প্রকরণ। দুঃখ, ক্ষোভ, উত্তেজনা, শান্তি, শৌর্যের বার্তা পৌঁছে দিতে ভারত নাট্য শাস্ত্রের বিভিন্ন রসের সমাহার দেখা গেছে ৭ মার্চের ভাষণে। শব্দ গুনে গুনে চরণ গুনে গুনে ঠিক যতদূর গেলে মাত্রাতিরিক্ত না হয়, ঠিক সেই মাপেই ভাষণটির বিস্তার, চড়াই উৎরাই দেখা গেছে। কোথাও ছিল না অতিকথন, না ছিল পুনরুক্তি। কোন প্রকার জড়তা ছাড়াই ঝড়ের বেগে কথা বলে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

তাঁর অবয়বে ছিল পিছু না হঠার দৃঢ়তা, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির জন্য উপচে পড়া আবেগ যা তাঁর অভিব্যক্তি বা বডি ল্যাংগুয়েজে উদ্ভাসিত হয়েছিল। রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত আবেগমথিত দশ লক্ষ জনমানুষের জন্য ছিল বার্তা, বার্তা ছিল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এবং বিশ্ববাসীর প্রতিও।

বঙ্গবন্ধু যা বিশ্বাস করেছেন, ভেবেছেন এবং বাস্তবসম্মত মনে করেছেন- সুচিন্তিতভাবে তাই ভাষণে বলেছেন। ৭ই মার্চের বক্তব্যের আগের দিন কী ভেবেছিলেন- তা নিয়ে তাঁরই কন্যা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ: কিছু স্মৃতি' শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখেছেন, সেদিন সাহস ও অনুপ্রেরণা দিয়ে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধুকে বলেছেন, 'সামনে তোমার লাঠি, পেছনে বন্দুক। তোমার মনে যে কথা আছে তুমি তাই বলবে। অনেকে অনেক কথা বলেছে। তোমার কথার ওপর সামনের অগণিত মানুষের ভাগ্য জড়িত, তাই তুমি নিজে যেভাবে যা বলতে চাও নিজের থেকে বলবে। তুমি যা বলবে সেটাই ঠিক হবে'।

একজন সার্থক কবির মতোই হৃদয়ের গভীরে নিজের আত্মপরিচয়, আপন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে ধারণ করে সেই উপলব্ধি থেকে সেদিন ভাষণ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। সিপাহি বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, গারো-হাজং বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহসহ অবিভক্ত ভারতে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত সব আন্দোলন-সংগ্রামকে অন্তরে ধারণ করেছিলেন। তারই রেশ ধরে ভাষণে স্পষ্টভাষায় সতর্ক বার্তা দিতে পারলেন, 'আর যদি একটা গুলি চলে.....।'

অতীত বিশ্লেষণ, বর্তমানের মূল্যায়ন এবং আগামীর ভাবনা দিয়ে সাজিয়ে ধীরে ধীরে বঙ্গবন্ধু ভাষণটিকে নিয়ে গেছেন পরিণতির দিকে – 'রক্ত দিয়েই রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে'। সবশেষে বললেন, 'এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকো'।আর তো কিছু বলার বাকি নেই। সেই কবিতার মতোই রূপকাশ্রয়ে বুঝিয়ে দিলেন বাঙালিকে কি করতে হবে।

প্রমিত বাংলা ব্যবহারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মতোই তিনি ব্যবহার করেছেন আঞ্চলিক ও লৌকিক বুলি। বাঙালিদের উদ্দেশ্যে করণীয় সম্পর্কে বলার সময় তিনি সচেতনভাবেই ব্যবহারিক জীবনের বুলি ও বাক্‌ভঙিমা ব্যবহার করেছেন যার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও সমবেদনা প্রকাশের পাশাপাশি মাটি ও মানুষের জন্য তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তাও প্রকাশ পেয়েছে।

তাই তিনি শিকড়ের ভাষায় বলেছেন, 'দাবায়ে রাখতে পারবা না'। অন্তর থেকে উৎসারিত আঞ্চলিকতায় ব্যবহার করেছেন – জীবনের তরে, হুকুম দেবার নাও পারি, বলে দেবার চাই, মনে রাখবা। নিঃসন্দেহে এই বৈচিত্র্যময় শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিতে ভাষণটি অনন্য বৈভবমন্ডিত হতে পেরেছিল। শব্দের সুনিপুণ কারিগর ছাড়া এ লালিত্য ছড়ানো দ:সাধ্য কাজ।

৩.

নিউজউইকের সেই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল, শেখ মুজিব তার জনসাধারণের কাছে ছিলেন একজন নায়ক। সভা-সমাবেশে লাখ লাখ লোককে আকর্ষণ করতে পারেন। আর সভা-সমাবেশে আবেগপূর্ণ ভাষায় দেওয়া তার ভাষণ সমস্ত জনসাধারণকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলে। জনৈক কূটনীতিকের ভাষ্য, তার সঙ্গে একাকী আলোচনা করতে গেলেও তিনি এমনভাবে কথাবার্তা বলেন, যেন তিনি প্রায় ষাট হাজার লোকের উদ্দেশে বক্তৃতা করছেন। তবে তিনি কখনোই একজন মৌলিক তত্ত্বকারের ভান করেন না।

ভাষণে স্বাধীনতার চেয়ে মুক্তি শব্দটা বঙ্গবন্ধু বেশি ব্যবহার করেছেন। এটি ছিল কবির মতো কৌশলে বিকল্প শব্দচয়ন। শুরুতে বলেছেন, 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়'। আবার শেষে দু'বার 'মুক্তি' শব্দ ব্যবহার করেছেন, প্রথমে, 'এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ' এবং পরে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করতে হয়, ভাষাতাত্ত্বিক বা পুরোদস্তুর কবি না হয়েও 'স্বাধীনতা' ও 'মুক্তি' শব্দদুটোর পৃথক দ্যোতনা বুঝে তিনি এভাবেই বলে গেলেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ নিয়ে নোবেল বিজয়ী শন ভ্যাকব্রাইড বলেছেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পেরেছিলেন, কেবল ভৌগলিক স্বাধীনতাই যথেষ্ঠ নয়, প্রয়োজন মানুষের মুক্তি, বেঁচে থাকার স্বাধীনতা। আর এ সত্যের প্রকাশ ঘটে ৭ মার্চের ভাষণে'। অমর্ত্য সেন বলেছেন, 'তিনি ছিলেন মানবজাতির পদপ্রদর্শক।... তাঁর সাবলীল চিন্তাধারার সঠিক মূল্য শুধু বাংলাদেশ নয় সমস্ত পৃথিবীও স্বীকার করবে'। ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছেন, এটি শুধুমাত্র ভাষণ নয়, এটি একটি রণকৌশলের অনন্য দলিল'। গ্রেট ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথ বলেছেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে যতদিন পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম থাকবে, ততদিন শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণটি মুক্তিকামী মানুষের মনে চির জাগরুক থাকবে। এ ভাষণ সারাবিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণা'। পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছেন, '৭ মার্চের ভাষণ একটি অনন্য দলিল। এতে একদিকে আছে মুক্তির প্রেরণা। অন্যদিকে আছে স্বাধীনতার পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা।'

'বিশ্বের ইতিহাসে এ রকম আর একটি পরিকল্পিত এবং বিন্যস্ত ভাষণ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে একই সংগে বিপ্লবের রূপরেখা দেয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে দেশ পরিচালনার দিকনির্দেশনাও দেয়া হয়েছে' বলে মন্তব্য করেছে থমসন রয়টার্স , বিবিসি, এএফপি, দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, আনন্দবাজার পত্রিকাসহ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো।

প্রতিবছর ৭ মার্চ আমাদের জীবনে এক অন্য রকম উপলক্ষ হয়ে আসে। ১৯৭১ সালের এ দিনে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণ সব ধরনের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বজ্রতুল্য ঘোষণা হিসেবে যেন বিরাজ করে। যে ভাষণ আবেগে টগবগ করে ফুটে, আবার বুদ্ধি ও

কৌশলের নির্মিতিও ঘটে সে ভাষণ বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে যুগপৎ সক্রিয় রাখতে বাধ্য। বঙ্গবন্ধুর বাগ্মিতার জাদুতে ভাষণটি ছিল এক তারে বাঁধা। এই গুণপনাগুলোর জন্যই কালোত্তীর্ণ শিল্পের মর্যাদা পেয়ে ভাষণটি একান্ন বছর পরও হয়ে উঠেছে আমাদের জন্য এক অনিঃশেষ প্রেরণার উৎস।

#

লেখক- সিনিয়র তথ্য অফিসার

২৮.০২.২০২২ পিআইডি ফিচার